উপসংহার

প্রত্যেক ভাষাগোষ্ঠী, জাতি-উপজাতি যেকোনো সমাজে লোককথার প্রচলন রয়েছে। যার ফলে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র লোককথা। লোককথা শুধুমাত্র মৌখিক সাহিত্যের ঐতিহ্য হিসেবেই নয়, সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লোককথায় ফুটে উঠে মূলত সমাজ জীবনের ছবি। সমাজে প্রচলিত বিশ্বাস, নারীপুরুষের অবস্থান, শ্রেণিবৈষম্য প্রভৃতি সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিশেষ দিক। এছাড়া লোককথায় প্রতিফলিত নারীর প্রতি নারীর দ্বন্দ্ব, ভালোবাসা প্রভৃতি হচ্ছে মনস্তাত্ত্বিক দিক। আর লোককথার বিভিন্ন বিভাগ বিশেষ করে কিংবদন্তীর কাহিনিতে খুব সামান্য হলেও ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। ফলে আধুনিককালে সমাজবিজ্ঞানীরা লোকসংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে লোককথার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আর সেজন্য লোককথার সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়নের ক্ষেত্রেও বিশেষ মাত্রা এসেছে। বিশিষ্ট লোকবিজ্ঞানীরা লোককথার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণে নানা তত্ত্ব ও পদ্ধতির আবিষ্কার করেছেন। যার ফলে সমগ্র বিশ্বের লোককথার মধ্যে যে বিভিন্নভাবে সংযোগসূত্র বা সাদৃশ্য রয়েছে তার পরিচয় নির্ণয় সহজ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছড়াকে ভাসমান মেঘের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। ঠিক একইরকমভাবে লোককথাকেও ভাসমান মেঘের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কারণ লোককথা নির্দিষ্ট এক ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ হয়ে থাকে না। বিভিন্ন সূত্রে তা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ভ্রমণ করে। যেমন- ব্যবসায়িক সূত্রে মানুষ এক এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ভ্রমণ করে। আবার আত্মরক্ষার তাগিদে কিংবা উন্নত জীবন ধারনের আশায় মানুষ এক দেশ থেকে আরেক দেশে আশ্রয় নেয়। এর ফলে মৌখিক সাহিত্যও তাদের সঙ্গে সঙ্গে এক দেশ থেকে আরেক দেশে সঞ্চালিত হয়। অর্থাৎ প্রব্রজনের মাধ্যমে লোককথা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বস্তুত সেখানকার স্থানিক ভাষিক রূপান্তরের মাধ্যমে তা কথকের মুখেমুখে প্রচলিত হতে থাকে।

সুদূর অতীতকালে অবসর বিনোদনের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো মাধ্যম ছিল না। ফলে সন্ধ্যার সময় অবসর সময় কাটানোর জন্য লোককথা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারন লোককথা গদ্যধর্মী, ফলে একটা লোককথা শেষ করতে বেশ কিছু সময়

লাগে। পাশাপাশি এর মধ্যে অনেক নাটকীয়তাও থাকে। ফলে শ্রোতারা বেশ মনোযোগ দিয়ে শোনে। কথকও আসরের কথা বিবেচনা করে নিজের খুশী মতো গল্পের আকার ছোট বড় করতে পারে। ফলে একটা সুন্দর আসর জমে উঠে সহজে। নানাধরনের লোককথা শ্রোতাকে যেমন এক অদ্ভূত কল্পনার জগতে নিয়ে যেতে পারে তেমনি তার চারপাশের বাস্তব জীবনকেও তুলে ধরতে পারে। যার ফলে কোন একজন ব্যক্তি বা একটা গোষ্ঠী যখন এক ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে অন্য ভৌগোলিক সীমায় প্রবেশ করে তখন তার স্মৃতির মাধ্যমে বয়ে নিয়ে যাওয়া লোককথাও সেখানে বিস্তার লাভ করে। অনেক সময় সেখানকার স্থানীয় লোককথার সঙ্গেও মিশে যায়। ফলে একই লোককথা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। শুধুমাত্র দেশ-কাল, ভাষা-সংস্কৃতির প্রভাবে এক নতুন রূপ লাভ করে।

প্রব্রজন ছাড়া ব্যবসায়িক সূত্রেও লোককথা এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভ্রমণ করে। যেমন অসমীয়া ভাষায় লোককথাকে বলা হয় 'সাধুকথা'। অর্থাৎ সাধু সন্ত বা জ্ঞানীর কথা। আবার অনেকের মতে 'সাধুকথা'র সাথে রয়েছে বণিকদের যোগাযোগ। আসামে প্রাচীনকালে বণিককে বলা হত 'সাউদ' বা 'সাধু'। এই সূত্রে বণিক অর্থাৎ সাধুর মুখে মুখে প্রচলিত বা সাধুর মুখে শোনা কথা বা কাহিনিই 'সাধুকথা' হিসেবে পরিচিত। কারণ বণিকেরা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পাড়ি দিতেন। দেশ-বিদেশ ঘুরে তারা আবার নিজের দেশে ফিরে আসতেন। এর ফলে সাংস্কৃতিক বিনিময়ও ঘটত। তারা যেমন নিজের দেশের লোককথা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে দিয়ে আসতেন, তেমনি সেখান থেকে নিয়েও আসতেন। এভাবেই লোককথার আদান প্রদান ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক। শুধুমাত্র আসামের ক্ষেত্রেই নয় সব দেশের ক্ষেত্রেই এই সূত্রটি সমানভাবে সত্য। উদাহরণ স্বরূপ আমরা যেমন দেখতে পারি আর্য-অনার্যের সাংস্কৃতিক সমন্বয়কে। আর্যগোষ্ঠী যখন অনার্যের আঙ্গিনায় প্রবেশ করল তখন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় একটি সাংস্কৃতিক আদান প্রদান ঘটল। বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবী, ব্রত-পার্বণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিষয়টি লক্ষ করা যায়।

মৌখিক সাহিত্যের প্রব্রজনের বিষয়টি বরাক উপত্যকার লোককথার ক্ষেত্রে

বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ভূমিকাংশের আলোচনায় দেখা গেছে যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠী বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এ উপত্যকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেছে। সঙ্গে করে তারা নিয়ে এসেছে নিজস্ব লোকঐতিহ্য, পরম্পরা, লোকউপাদান ইত্যাদি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী, জনগোষ্ঠীর মিলনভূমি এই উপত্যকা একসময় পূর্বপাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশের অংশ ছিল। দেশভাগের ফলে অনেক মানুষকে ভিটেচ্যুত হতে হয়েছে। ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে এক জায়গা থেকে অরেকজায়গায় ছুটতে হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যেমন প্রচুর সংখ্যক মানুষ শরণার্থী হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আশ্রয় নিয়েছে। তেমনি পূর্ব-পাকিস্তান থেকে প্রচুর সংখ্যক লোক শরণার্থী হয়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিশেষ করে ত্রিপুরা, পশ্চিমবঙ্গ আর আসামে আশ্রয় নেয়। যেহেতু পূর্ব-পাকিস্তানে অধিকাংশই বাংলাভাষাভাষী অর্থাৎ বাঙালি তাই তারা বাঙালি অধ্যুষিত রাজ্য তিনটিতেই বেশি নিরাপদ বলে মনে করেন। প্রব্রজনের এই প্রক্রিয়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম হওয়ার পরও নিরাপত্তার খাতিরে প্রচুর সংখ্যক লোক আসামে চলে আসেন। বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, ঢাকা ইত্যাদি জেলা থেকে বাঙালিরা আসাম ও অন্যান্য রাজ্যে প্রবেশ করেন। বিশেষ করে বরাক উপত্যকায় এই সংখ্যাটা বেশি। কারণ, আগেই বলা হয়েছে যে এই অঞ্চলটি একসময় সিলেটের সঙ্গে যুক্ত ছিল। যার ফলে এই অঞ্চলে বাসিন্দারা যেমন 'সিলেটি' হিসেবে পরিচিত, তেমনি এদের জনসংখ্যাও বেশি।

বর্তমান বাংলাদেশ থেকে প্রচুর হারে প্রব্রজনের ফলে বরাক উপত্যাকার জনবিন্যাস নতুনভাবে গড়ে উঠে। একদিকে দীর্ঘকাল থেকে বসবাসকারী বাঙালি, মণিপুরি, খাসিয়া, হ্মার, ডিমাছা, নাগা, অসমীয়া ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী ও জনগোষ্ঠী, আর অন্যদিকে বর্তমান বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে প্রচুর বাঙালি। যদিও এই দুই অঞ্চলের মধ্যে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত পার্থক্য খুব বেশি নেই। তথাপি আঞ্চলিক ভাষাগত ও লোকাচারগত পার্থক্য কিছু পরিমাণে রয়েছে। যেমন সিলেট অঞ্চলের ভাষা, খাদ্য, ব্রতপার্বণ, লোকাচার ইত্যাদি ময়মনসিংহ বা চট্টগ্রাম বা কুমিল্লা অঞ্চলের থেকে আলাদা। কিন্তু

দীর্ঘদিন এখানে পাশাপাশি বসবাস করার ফলে স্বাভাবিক নিয়মে একটা সমন্বয় ঘটে গেছে। পাশাপাশি অবস্থানের ফলে সব মিলে একটা নতুন রূপ লাভ করেছে। ভাষা, খাদ্য, লোকসংস্কার, ব্রতপার্বণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে এই নতুনরূপ লক্ষ করা যায়। ভাষার ক্ষেত্রে যেমন এক মিশ্র রূপের সৃষ্টি হয়েছে তেমনি সমন্বয়ী প্রক্রিয়ার ঘটনা ঘটেছে মৌখিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও। ফলে মৌখিক সাহিত্যও একটা মিশ্র রূপ লাভ করেছে। যেমন- 'মিষ্টি লাউগাছ' লোককথাটিতে ছড়ার রূপে যে মন্ত্রের উল্লেখ আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে এই আঞ্চলিক ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন-

'লাউ গাছ লাউ গাছ
বেরি বেরি যাছ।
কষ্ট করি **রুইছি** তরে
মারছে তরে **আইজ**।
সাত গাছা সূতা দিয়া
বান্দি দিলাম তরে
আবার তুই **জিয়াইয়া** উঠ
চাঙ্গর উপরে।"

বেরি বেরি বেড়ে যাওয়া, রুইছি রোপন করেছি, আইজ আজ, সাত গাছা সূতা সাতটি সূতা একসঙ্গে, বান্দি বেঁধে দেওয়া, জিয়াইয়া জিইয়ে, জীবিত হয়ে ওঠা, চাঙ্গর মাঁচার

লোককথার শুরু এবং সমাপ্তির এক বিশেষ রীতি রয়েছে। সব দেশের লোককথার ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে লোককথা শুরু হয় 'এক যে ছিল' বা 'এক গ্রামে ছিল এক' বা 'এক রাজ্যে ছিল এক রাজা' ইত্যাদি এ ধরনের বাক্য দিয়ে। নির্দিষ্ট কোন রাজ্য বা রাজার নাম, নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা স্থানের নামের প্রায়ই উল্লেখ থাকে না। কথাগুলোতে সাধারণত শুভ শক্তির জয় হয় আর অশুভ শক্তির পরাজয় হয়। দোষী, অন্যায়কারী

তথা দুষ্ট চরিত্র তার উপযুক্ত পাপের বা অন্যায়ের শাস্তি পায়। বরাক উপত্যকার লোককথাও এর ব্যতিক্রম নয়। যেমন- আমাদের সংগৃহীত বেশিরভাগ লোককথার শুরুতে দেখা যায় লোককথাটি শুরু হয়েছে- 'এক গ্রামে এক ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী ছিল' (কর্মপুরুষের ব্রতকথা), 'এক সদাগর ছিল' (সদাগর আর ময়নাপাখি), 'কোন এক গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাস' (ব্রাহ্মণের ভাগ্য উদয়), 'এক গ্রামে এক জ্যোতিষ ছিল' (ভাগ্যফল) ইত্যাদিরকম ভাবে। পশুকথার শুরুতে দেখা যায় 'এক বনে ছিল এক সিংহ' (অত্যাচারী সিংহ), 'এক চড়া আর চড়ী ছিল' (চড়াই আর চড়ুনীর কথা), 'একটি বাঘ ছিল' (ব্যাঙ ও বাঘ) ইত্যাদি।

লোককথার শেষে দেখা যায় মিলনাত্মক বা সুখ সমাপ্তি। যেমন- কর্মপুরুষের ব্রতকথায় দেখা যায় যে দ্বিতীয় পত্নীর যন্ত্রণায় ব্রাহ্মণ তার দুই মেয়েকে বনে রেখে আসে। এবং কাহিনির শেষে দুই মেয়ের সঙ্গে ব্রাহ্মণের মিলন হয় এবং তারা সবাই একসঙ্গে মিলে মিশে সুখে শান্তিতে বসবাস করে। 'বিপদনাশিনীর ব্রতকথা'য় বরকইন্যা তার শ্বশুরের ইচ্ছা পূরণের জন্য দেবীকে তুষ্ট করতে নিজের সন্তানের গলা কেটে দিঘিতে ফেলে দেয়। কিন্তু কাহিনির শেষে সে তার ফুলের মত শিশুকে জীবিত অবস্থায় ফিরে পায় এবং শ্বশুরের ইচ্ছাও পূরণ হয়। 'কাঁঠাল পাখি' আর আর 'রঙবেরঙের পালক' লোককথায় অসহায় ছেলেটি এবং মেয়েটি তাদের সৎ মায়ের যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। 'ব্রাহ্মণ আর শকুনের পাখা' লোককথাটিতে দেখা যায় যে শকুনের আশ্চর্য পাখা পেয়ে দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রচুর ধন সম্পত্তি লাভ করে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে থাকে। একইরকমভাবে 'ব্রাহ্মণের ভাগ্য উদয়' লোককথাটিতেও দরিদ্র ব্রাহ্মণ ভাগ্যের সহায়তায় প্রচুর পুরস্কার ধন সম্পত্তি লাভ করে। যার ফলে তার দুঃখের দিন দূর হয় আর সুখের দিন আসে। 'কুমীর আর বাঁদরের বন্ধুত্ব' কথাটিতে দেখা যায় যে বাঁদর তার বুদ্ধির জোরে বিশ্বাসঘাতক বন্ধুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়, 'অত্যাচারী সিংহ'-এর কাহিনিতে দেখা যায় অত্যাচারী সিংহের মৃত্যু হয় আর বনের পশুরা সুখে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে, 'বাঘ আর কৈ মাছ' লোককথায় বাঘের অহংকারের পতন হয়, 'চড়াই আর চড়ুনীর কথা' লোককথাটিতে দুষ্ট কাক তার পাপবুদ্ধির জন্য আগুনে

পুড়ে মরে, 'বড় বউ আর ছোট বউ' লোককথায় রাজা দুষ্ট ছোট বউ আর তার মেয়েকে তাদের অন্যায় কর্মের শাস্তি স্বরূপ বনবাসে পাঠায়। এইরকম বিভিন্ন লোককথায় সবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের জয় ঘোষিত হয়েছে, তেমনি আবার দুষ্ট লোকের শাস্তিও ঘোষিত হয়েছে। তবে এ উপত্যকার লোককথায় কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষ করা যায়। যেমন- 'সদাগর ও ময়না পাখি' লোককথাটির সমাপ্তি মিলনাত্মক নয়, বিয়োগাত্মক। গল্পের শেষে সদাগর তার প্রিয় ময়না পাখিটিকে হারায় এবং তার দুঃখে কাঁদতে থাকে। একইরকমভাবে 'ভাই বোনের কিচ্ছা' লোককথাটির সমাপ্তি বিয়োগাত্মক। কারণ ভাইকে বনের বাঘ খেয়ে ফেলে আর বোন সেই জঙ্গলে ভাইয়ের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। এদের দুজনের আর মিলন হয় না। অর্থাৎ বিচ্ছেদেই কাহিনিটি সমাপ্ত হয়। 'নাপিতের স্বর্গ যাত্রা' লোককথাটিতে নিরপরাধ নাপিতকে ব্রাহ্মণের দুষ্ট বুদ্ধির জন্য সুড়ঙ্গের ভিতরে প্রাণ হারাতে হয়েছে। 'মিষ্টি লাউগাছ' লোককথাটিতে বড় বউ আর তার মেয়ে সতীন ছোট বউয়ের যন্ত্রণায় মরে লাউ গাছ আর লাউ হয়ে থাকে। কিন্তু কাহিনির শেষে দুষ্ট ছোট বউয়ের শাস্তির কোন উল্লেখ নেই।

লোককথার শেষ হওয়ার আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমাপ্তিজ্ঞাপক ছড়া। বাংলা লোককথার সমাপ্তিজ্ঞাপক সুপরিচিত ছড়াটি হল-

'আমার কথাটি ফুরালো
নটে গাছটি মুড়ালো
কেন রে নটে মুড়ালি?
গরুতে কেন খায়?
কেন রে গরু খাস?
রাখাল কেন চড়ায়?'

তবে সব লোককথার ক্ষেত্রে এই ছড়াটি শোনা যায় না। আবার যেগুলির মধ্যে শোনা যায় তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রথম দুটি চরণই শোনা যায়। বরাক উপত্যকার লোককথার ক্ষেত্রেও সমাপ্তিজ্ঞাপক ছড়া শোনা যায়। যেমন 'সোনার গাছ রূপার পাত, তার উপরে হীরামন তোতায় নৃত্য করে' রূপকথাটির সমাপ্তিজ্ঞাপক ছড়ায় পাওয়া যায়-

'খায় থাকে আছে ভালা।

ঘুমাই থাকে সইন্ধ্যাকালা।।'

অর্থাৎ খেয়ে-দেয়ে ভালো আছে এবং সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়ে। এখানে সুখী জীবনের চিত্র প্রতিফলিত হয়। গ্রামে সন্ধ্যাবেলা ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস। কেননা একদিকে সমস্তদিনের পরিশ্রম আর অন্যদিকে গল্পগুজবের বাইরে সময় কাটানোর তেমন কোন উপাদান ছিল না। সুতরাং লক্ষণীয় যে লোককথার সমাপ্তিজ্ঞাপক ছড়াটি গ্রামীণ সংস্কৃতি তথা গ্রামজীবনের চিত্রকেই তুলে ধরে।

একইরকমভাবে কিছু ব্রতকথার সমাপ্তিতে শোনা যায়-

'যে যে মনোবাসনা করে মনোবাসনা পূর্ণ হয়

কাটা মাথা জুড়া লয়

নির্ধনে ধন হয়

হারায় ধনে ঘর লয়'

অর্থাৎ সেই ব্রত করলে বা দেব-দেবীকে সন্তুষ্ট করে কৃপা লাভ করতে পারলে সমস্ত অমঙ্গল দূর হয় লাভ হয়। কাটা মাথা জুড়া লয় অর্থাৎ মৃত ব্যক্তি প্রাণ ফিরে পেতে পারে, যার ধন নেই তার ধন লাভ হতে পারে, যদি ধন সম্পত্তি হারায় বা ক্ষতি হয় সেই ধন বা সম্পত্তি ফিরে আসে ঘরে।

'ভাই বোনের কিচ্ছা' লোককথাটির শেষে শোনা যায় -

'ভাইরে খাইছে বনের বাঘে।

আমার বড় দুঃখ আমার বড় দুঃখ।।"

'জামাইর কাঁঠাল খাওয়া' লোককথাটির শেষে শোনা যায়-

'সাধলে জামাই খায় না কাঁঠাল।

বুথা লইয়া লড় পাড়ে।।'

এই ছড়াটি এ উপত্যকায় প্রবাদ হিসেবেও প্রচলিত।

আবার বেশিরভাগ লোককথার ক্ষেত্রে সমাপ্তিজ্ঞাপক ছড়ার উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং এ উপত্যকার লোককথার শুরু এবং সমাপ্তির ক্ষেত্রে একটা নিজস্বতা লক্ষ করা যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এ উপত্যকায় মাত্র একটি রূপকথাই আমাদের সংগ্রহে এসেছে। এর থেকে মনে করা যায় যে এখানে রূপকথার সংখ্যা খুবই কম। আর পরী কথা একটাও পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র পরীকথা সংক্রান্ত কিছু গল্প শোনা যায়, কিন্তু এর মধ্যে কোন কাহিনি নেই। এ উপত্যকার কেন্দ্রীয় শহর শিলচর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরত্বে লাংখুন বলে একটি জায়গায় পরীকে নিয়ে কিছু গল্প শোনা যায়। সেখানে চা বাগানের উপরে একটি জলাশয় রয়েছে। যেখানে সব সময় গরম জলে মত ভাপ উঠতে থাকে। শোনা যায় যে এই জলাশয়টিতে নাকি পরীরা এসে স্নান করেন। এবং লোকজনের শব্দ পেলে অদৃশ্য হয়ে যান। এর বাইরে পরীকে নিয়ে আর কোনও গল্পের পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং এই দিক থেকেও এ উপত্যকার লোককথার এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

লোককথার অন্যতম বৈশিষ্ট্য তার বিশ্বজনীনতা বা সর্বজনীনতা। অর্থাৎ একই লোককথা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপে পাওয়া যায়। ফলে একটি লোককথার প্রকৃত উৎসস্থল নির্ণয় করা খুব কঠিন। তবে আপাতদৃষ্টিতে একটি লোককথা যে অঞ্চলে বা যে সমাজে প্রচলিত সেই অঞ্চলের বা সেই সমাজের লোককথা বলেই সেটি পরিচিত হয়। যার ফলে একই লোককথা বিভিন্ন অঞ্চলের, বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সমাজের প্রচলিত লোককথা হিসেবে পাওয়া যায়। কিছু কিছু পার্থক্য অবশ্য তার মধ্যে থাকে। কেননা লোককথার ক্ষেত্রে কথকের ব্যক্তিত্ব এবং অবস্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লোককথা অনেকটা নির্ভর করে কথকের বলার ভঙ্গিমা, রুচিবোধ এবং অতি অবশ্য শ্রোতার উপরও। কথক ইচ্ছে করলে একটি লোককথাকে অনেক লম্বা করতে পারেন। আবার ইচ্ছে করলে সংক্ষিপ্ত করে দিতে পারেন। ফলে একই লোককথা কোথাও অনেক দীর্ঘ, আবার কোথাও তার আকার খুব ছোট। অন্যান্য অঞ্চলের মত বরাক উপত্যকার লোককথাও এর ব্যতিক্রম নয়।

এই উপত্যকায় প্রচলিত লোককথার বিভিন্ন পাঠান্তর যেমন পাওয়া যায়, তেমনি

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ও বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। যেমন 'চড়া এবং কাকের কিচ্ছা'টি এ উপত্যকার খুব পরিচিত লোককথা। কিন্তু এই লোককথাটি উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই'য়ে রয়েছে। আবার অসমীয়া ভাষায়ও এই লোককথাটি শোনা যায়। লক্ষীনাথ বেজবরুয়ার 'বুঢ়ি আইর সাধু'তে 'ঢোঁরা কাউরী আরু টিপচী চড়াই' নামে লোককথাটি সংকলিত হয়েছে। আমরা যার কাছ থেকে এই লোককথাটি সংগ্রহ করতে পেরেছি তার মূল বাড়ি বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায়। দেশ ভাগের সময় তিনি এ উপত্যকায় চলে আসেন। এক সময় এই ময়মনসিংহ জেলা আসাম প্রদেশের সঙ্গেই ছিল। ফলে এতদ অঞ্চলের সঙ্গে এই লোককথাটির ঘনিষ্ঠতা অস্বীকার করার উপায় নেই। একইভাবে 'ব্রাহ্মণের ভাগ্য উদয়' লোককথাটি অসমীয়া ভাষায় প্রচলিত এবং বেজবরুয়ার গ্রন্থে 'সরবজান' নামে সংকলিত। তবে লোককথা দুটির টাইপ বা মোটিফ এক থাকলেও বর্ণনাশৈলী, চরিত্র, ঘটনার স্থান ইত্যাদির ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য রয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকেও 'চালাক ব্রাহ্মণ' নামে ঠিক একই ধরনের একটি লোককথা প্রচলিত রয়েছে। 'কুমীর আর বাঁদরের বন্ধুত্ব' লোককথাটি কন্নড় আর তামিল ভাষাতেও প্রচলিত। 'সোনার গাছ রূপার তার উপর হীরামন তোতায় নৃত্য করে' রূপকথাটির ও একটি খণ্ডাংশ উর্দুতে 'তাঁতীর স্বর্গযাত্রা' এবং বিহারে 'স্বর্গের হাতি মর্ত্যের মানুষ' নামে প্রচলিত। তবে এদের মধ্যে অনেকটা পার্থক্য লক্ষ করা যায়। সুতরাং দেখা যায় যে বিশ্বের মৌখিক সাহিত্যের যে সুবিশাল ঐতিহ্য বরাক উপত্যকা এর থেকে আলাদা নয়। এ উপত্যকায় এখনও আরো কিছু সংখ্যক লোককথা অসংগৃহীত অবস্থায় রয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। এই লোককথাগুলো সংগৃহীত হলে বরাক উপত্যকার লোককথা সম্পর্কে আরো তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

বরাক উপত্যকার লোকঐতিহ্য এই অঞ্চলের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। লোকসংস্কৃতির বহু মূল্যবান উপাদান এই অঞ্চলে এখনও বিদ্যমান। সুখ-দুঃখ নিয়ে মানুষের যে জীবন তা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে এই উপত্যকার লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই গ্রামের। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার গতি এখানে মন্থর। তাই এই অঞ্চলটি আজও অন্যান্য জায়গার তুলনায় অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। তবে এই

কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে বিশ্বায়নের হাওয়া এই প্রান্তীয় অঞ্চলেও আছড়ে পড়েছে। এখন অবসর বিনোদনের বা মনোরঞ্জনের বহু মাধ্যম পৌঁছে গেছে গ্রামের অন্দরমহলেও। ফলে আজকাল ছোট ছোট শিশুরা তাদের ঠাকুরমা-ঠাকুরদা কিংবা মা-বাবা-পিসী-মাসীর কাছে বসে রাক্ষস-রাক্ষসীর গল্প শুনতে চায় না। বরঞ্চ বিভিন্ন ধরনের কার্টুন দেখতেই তারা অভ্যস্থ হয়ে পড়ছে। আরো নানা কারণে এই গ্রাম বরাকের মৌখিক সাহিত্যের বহু উপাদান লুপ্ত হওয়ার পথে। তবে কিছু মানুষ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়েও এই ঐতিহ্যকে এখনও ধরে রেখেছে। তাদের কাছে আজও তা অমূল্য সম্পদ হিসেবে জীবিত রয়েছে। এগুলোর সংগ্রহ ও সংরক্ষণ খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই অভিসন্দর্ভ সে রকমই এক ক্ষুদ্র প্রয়াস।